অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না

সুত-মিত বাঙালি সমাজে

মনফকিরা
www.monfakira.com

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়
খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না
সুত-মিত বাঙালি সমাজে
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২
স্বত্ব: বারিধারা মুখোপাধ্যায়
ISBN: 978-93-80542-36-2
প্রকাশক: মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায়: ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন ও ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন: ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১, ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২, ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট: www.monfakira.com
ব্লগ: http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক: https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/
ই-মেল: monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in
গ্রন্থসজ্জা হরফবিন্যাস ও প্রচ্ছদ: মনফকিরা
মুদ্রণ: বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬ পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
১৫০ টাকা

শ্রী রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী প্রবীর ভট্টাচার্য
এবং অবশ্যই
সম্পাদক শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়-কে

সূ চি

আত্মপক্ষ ৯
ভাগ্যিস তুমি চোখে দেখতে পেতে না, ধৃতরাষ্ট্র ১১
অপূর্ব শোভন ভবজলধির পারে. . . ১৩
সামনে যা দেখি, জানি না ‘সে কী’ ১৬
ডিলানের গিটার আর ভ্যাবাচাকা ১৯
চেনা দুঃখ, আধা-চেনা কিছু সুখ ২১
কোথায় বসাব বল তুমি ফিরে এলে ২৩
হায় গো, আমার ভাগ্য-রাতের তারা ২৬
টুনির সাবভার্সনে ছারখার সোনার বং ২৯
আজ কোথায় গেলে, সেই ছেলেরা ৩১
আর যেখানে যাও না রে ভাই. . . ৩৪
অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে আপনি. . . ৩৭
ভোলেবাবা পার করেগা. . . ৩৯
বরিণু তোমায়, স্মরিণু তোমায়, হে গুণী. . . ৪২
অল্প নিয়ে থাকতে চাইলে দোষ আছে কি ৪৫
ফেস্টবাজি অথবা কিমাকার কিম্ভুত ৪৮
আর কী আসবে সেই টেলিফোন. . . ৫১
বড্ড চালাক সবাই, বোকারা কোথায় ৫৪
কারও কপাল পুড়ছে, কেউ ফুলে লাল ৫৬
ইমোশন নিয়ে বরবাদির আমরাও সঙ্গী ৬০
জ্ঞানের কুস্তি আর অজ্ঞানের মস্তি ৬২
লিখন সকল, ধূলায় হয়নিকো ধূলি. . . ৬৫

ইউনিয়ন অথবা দিল্লি-কা লাড্ডু ৬৮
গ্লোবাল বাবুবিলাস অথবা ভ্রমণবৃত্তান্ত ৭১
ও কী যুগল রূপ, ভুলিল বঙ্গজন ৭৪
এজমালি বাঙালিয়ানা, কাল আর আজ ৭৭
হয় হয়, Zানতি পারো না. . . ৮০
শৈশব মানে কি তবে কুমড়োর ঘ্যাঁট. . . ৮৩
মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে ৮৬
অতিথি সৎকার অথবা বাঙালি পুরাণ ৮৮
ঠাকুর তোমায় কে চিনত, না চেনালে. . . ৯১
ধেনু জলওলার গলি ও ক্যালকাটানস ৯৪
লাভ নেই, লোভ নেই, নেই. . . ৯৬
ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা. . . ৯৯
কবিতার শিখা এবং উড্ডীন পতঙ্গকুল ১০২
কেন যে পেটাও বারে বারে. . . ১০৫
ঢোলকপুরের কীর্তিমান আর খুদে দর্শকরা ১০৭
থাক তোর চিড়িয়াখানা, চললাম. . . ১১০
বাঙালির উইকেন্ডোস্কোপি, রিসর্ট-বিলাস ১১২
ত্রিকালজ্ঞ যোগী হে, নমি বারম্বার ১১৫
মুখের হাসি রইল মুখেই, রইল না শুধু. . . ১১৮
সেই তিমিরেই মিরচি ও মীর ১২১
তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে ১২৩
এই পথ যদি না শেষ হয় ১২৬
ব্যোমকেশ নয়, বিশুদ্ধ বোম্বাচাক ১২৮
শতবর্ষেও রুদ্ধজনের অর্গলমুক্তি ঘটল কি ১৩২
সম্মানদক্ষিণা বড়ই অসম্মানজনক, তবু. . . ১৩৪
লঘুতায় ডুবে যায় অমৃত ‘সিরিয়াস’ ১৩৬
বুরি নজরওয়ালে তেরা মুহ কালা ১৩৯
সিমের স্কিম আর বাজারুদের মজারু ১৪১
মাঝ বরাবর ও মাঝ বরাব্বর ১৪৪
বদনামি মুন্নি ও দয়ালবাবার সরস কাহিনি ১৪৬
এ শুধু থিমের দিন, এ লগন. . . ১৫০
আমরা বিলেত-ফেরতা ক’ভাই ১৫৩

আত্মপক্ষ

চাউমিন খাচ্ছিলাম। সন্ধ্যালগ্ন, হেদুয়াপাড়, কাছের গির্জাটির গথিকতা আর পাশের সদ্যনির্মিত রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ কেন্দ্রের মধ্যভাগ। জড় ও অজড়— দুই ডায়ালেকটিক নয়, বাইবেল ও বেদান্তের মধ্যে কোন অনির্দেশ্য ধূসর পরিবেশ, হেমন্তরাত নয়। এ শর্মাও সুবিনয় মুস্তাফী নয়। তবু এক অমোঘ টেলিফোনে ‘ভূয়োদর্শী’ হয়ে ওঠার আহ্বান। এমনটাই পরিস্থিতি। ‘একদিন’ তখন ঈষৎ দীর্ঘনামা— ‘আইকোর একদিন’, সেই পত্রিকায় একটি সাপ্তাহিক কলাম লেখার অনুজ্ঞা। প্রথমে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে তাঁর কথার সূত্র ধরেই প্রবীর ভট্টাচার্য। এমন এক কলাম, যা কিনা বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলবে। অনুপম ত্রিবেদীও নয় এ জীবন। ‘স্ট্যালিন, নেহরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা বয়ে’ চলা বাঙালি কোমর ও ক্রনিক ফেটিগ সিনড্রোমে ঝুঁকে-পড়া চল্লিশোর্ধ্ব পৃষ্ঠদেশ কি বইতে পারবে এই বোঝা? একদিন কম্পিত বক্ষে ঝড়বাদল সাপটে ‘একদিন’-এর আস্তানায়। কলকাতার বুকে সেই বোধ হয় অভিসন্ধিহীন শেষ বৃষ্টিপাত, তার পর প্রতি সপ্তাহে ‘একসাথে বেড়াল ও বেড়ালের মুখে-ধরা ইঁদুর’ হাসানোর জুমানজি গেম।

২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল ‘খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না’, ২০১১ অতিক্রম করেও টিকে রয়েছে এই সাপ্তাহিক অশৈল কলামটি। এর জন্য ঠিক কে দায়ী, বলা মুশকিল। অগ্রজপ্রতিম রাঘবদার গুড উইশ, বিভাগীয় সম্পাদক প্রবীরদার সস্নেহ আশকারা ও পরামর্শ, আর সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের উদার শ্মশ্রুমমতামাখা প্রশ্রয়— কোন্‌টা এর মধ্যে, নাকি সবগুলোই একসঙ্গে, এই দু’-বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা কৃত্যটির পিছনের প্রণোদন. . . মাঝে-মাঝে ভাবি। তবে এই রন্ধনশালার পাক ও চক্রের আর-একটি পিঠ হলেন পাঠক। যাঁরা মাঝে-মাঝে সরব হন, এসএমএস অথবা ফোন করে জানান তাঁদের রি-অ্যাকশন। এ ভাবেই সম্ভব ছিল

গল্পটা। এ ভাবেই হয়তো সম্ভব থাকে সব কিছু। কিন্তু এর মধ্যে অ-সম্ভবও যে ওত পেতে রয়েছে, বুঝলাম 'মনফকিরা' থেকে সন্দীপন ভট্টাচার্যের বই করার প্রস্তাব পাওয়ার পর। ওকে, বস্। চলো। তথাস্তু। দু'-মলাটের মধ্যে প্রথমে ইচ্ছা ছিল সিলেকশনের। সন্দীপনদার ইচ্ছাতেই প্রায় বাদ-ছাদ না-দিয়ে 'প্রথম খণ্ড'। জনক-জননীতুল্য পাঠকের আশনাইলব্ধ হলে 'দ্বিতীয়'ও বেরুবে, এমন এক হুমকি এর মধ্যে যে রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

ইত্যবসরে, একটু কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন অবশ্যই বোধ করছি। 'একদিন'-এর সম্পাদকীয় বিভাগের বন্ধু বিনায়ক ভট্টাচার্য ও সুমন রায়কে টপকে এ কলাম স্বাবলম্বী নয়। স্বনির্ভর নয় বন্ধু দেবাশিস বিশ্বাস, রবিশংকর বল, সেলিম মল্লিককে এড়িয়েও। কৃতজ্ঞতা থাকছে মুদাস্সর ওরফে সাগরচন্দ্রের কাছেও। সে যদি স্ক্র্যাপ হিসেবে সঞ্চিত না-রাখত এই সব আবরজঙ্গল, তা হলে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের দুষ্কর্মটি এ জীবনে হত কি না সন্দেহ। আর-একজন পাঠক ছিলেন এ লেখার। পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ২০১০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাঁর কথা থাক। কায়াজগতের ওপারে খবরের কাগজ বোধ হয় কাজে লাগে না। তবে, তাঁরই লজ্জ, তাঁরই অ্যানেকডোট আর রসবোধ যে এ লেখার পরতে-পরতে, আর কেউ না-জানুক, শাদা পৃষ্ঠারা জানে।

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা
জানুয়ারি ২০১২

ভাগ্যিস তুমি চোখে দেখতে পেতে না, ধৃতরাষ্ট্র

আজকাল একটা ব্যাপার খুব ভাবায় যে, দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল-মশাই যদি বেঁচে থাকতেন ও তাঁর 'অচলপত্র' যদি বেরুত, তো তিনি কী লিখতেন? চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে উনিশশো ছেষট্টি সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যে-কাণ্ড রেখে গেছেন, তা বহু লোকেরই না-পসন্দ, আবার অনেকের বেজায় আমোদের সম্বল হয়ে উঠেছিল। দীপ্তেনবাবুর আক্রমণের লক্ষ্য খুব বেশি ছিল না— বাংলা সাহিত্য, অল ইন্ডিয়া রেডিও, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি, আর বড়জোর সিনেমা-থিয়েটার। 'ছেষট্টি সালে বসে দুঃস্বপ্নেও মিডিয়া বিস্ফোরণকে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। তবে এ কথা বোধ হয় সাহস করে বলা যায় যে, আজকের এই প্রবল মিডিয়াবাজির বাজারে একজন দীপ্তেন সান্যাল সুবিধে করতে পারতেন না।

অল ইন্ডিয়া রেডিওর আপিস তখন এক নম্বর গার্স্টিন প্লেস-এ। দীপ্তেনবাবু ঠাট্টা করে 'এক নম্বর ডাস্টবিন প্লেস' নাম দিয়ে ফিচার লিখতেন। আজ যদি তেমন লিখতে হয় তো কতগুলো ডাস্টবিনের ঢাকনা খুলতে হবে? তুলনায়, আকাশবাণী ও তার এফএম চ্যানেল তুশ্চু। তারা তাদের গ্ল্যামারহীন অবস্থানকে আঁকড়ে ধরে যেমন করেই হোক টিকে থাকবে। কিন্তু বাকি বেসরকারি এফএম-দের ধামাকাকে কী বলবেন? বাঙালির রেডিও শোনার অভ্যস্ত কান এই ক'বছরে দেদার বদলেছে। কিন্তু যাকে 'লিসনারশিপ' বলে, তা কি তৈরি হয়েছে এই সব চ্যানেলের? যে-কোন বেতার কেন্দ্রেরই চব্বিশ ঘণ্টার প্রোগ্রাম শিডিউল থাকে। এই সব খুচরো এফএম-দেরও নিশ্চয়ই তেমনটা আছে। কিন্তু কেউ যদি নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা এদের কোন একটাকে খুলে বসে থাকেন, তো দেখবেন যে এর মধ্যে কোন ছেদ নেই, অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের মতো চাক্মাদার গান হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে। আর মাঝে-মাঝে 'ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে' গোছের আর-জে-দের কণ্ঠবাদন, একেক জনের বাংলা

শুনলে মনে হয় যেন কেউ কর্ণকুহরে বাংলা মদ ঢেলে দিচ্ছে। 'ড়' আর 'র'-এর বাবা-মা নেই, সব 'স'-ই 'শ', সর্বনামে আট থেকে আশি সবাই 'তুমি', আর সেলিব্রিটিরা সকলেই ওদের অগ্রজ ও অগ্রজা (প্রায় সহোদর)। দিনের পর দিন কেবল জিঙ্গল, বেকাবু এতোল-বেতোল আর ব্যাক-টু-ব্যাক গান চালিয়ে যে চ্যানেল চলতে পারে, তা এ দেশের বেসরকারি এফএম চ্যানেলই প্রথম দেখাল।

গত কয়েক দিনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্প্রতি বেরুনো দুটো বাংলা সিনেমার রিভিউ পড়তে গিয়ে আবার ভোমলা মেরে গেলুম। 'অংশুমানের ছবি' আর 'সব চরিত্র কাল্পনিক'। এ দুটোকে কোন কাগজই 'খারাপ' বলেনি, আবার কেউই এ দুটোর কোন সদর্থক দিকও দেখাতে পারেনি। হেডিং-এ যদি কেউ ঠোনা মেরে থাকেন, তো বডি-তে তাদের সম্পর্কে 'না-না, মন্দের ভালো' গোছের বাতেলা ঝেড়েছেন। আর হেডিং-এ যাঁরা প্রশংসা করেছেন, বডি-তে তাঁরাই 'তেমন কিছু নয়' বলে দায় এড়িয়েছেন। ব্যাপারটা কী? একগাদা রিভিউ পড়ে মনে হয়, দুটো ছবিই ভুষিমাল। তো, তাকে 'ভুষিমাল' বলতে রিভিউয়ারদের বাধা কোথায়? বাঙালি বাৎসরিক ফিল্মোৎসবে গিয়ে গোদারের গোড়ার গলদ অথবা ফেলিনির ফেলিওর নিয়ে নন্দন চত্বরের বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বাড়ান, তাঁরাই এই সব না-ঘরকা না-ঘাটকা ছবিকে এক-কথায় রাবিশ বলতে ঠেক খান কেন? ছবির ভালো-মন্দ পরের কথা, প্রসঙ্গ ফিল্ম সমালোচনার ভাবভঙ্গি নিয়েই। অনেক কাগজ তো আবার ফিলিমের নায়ক-নায়িকা-পরিচালকদের দিয়েই সমালোচনা লেখায়। আম-পাঠক কোন ক্রেডিবিলিটিতে ন্যক্কারজনক দশম শ্রেণির বাংলা ছবির ততোধিক চতুর্দশ শ্রেণির হিরো-হিরোইন-ডিরেক্টরের মুখে ঝাল খেয়ে ছবির নন্দনতত্ত্ব শিখবেন? পেডাগগি-র একটা সীমা আছে। সংগীত বাংলা চ্যানেলে সাম্প্রতিক বাংলা সিনেমার প্রোমো দেখাতে গিয়ে নায়ক-নায়িকা-ডিরেক্টরের ইন্টারভিউ দেখানো হয়। এই সব সাক্ষাৎকারে তাঁরা এমন ভাবভঙ্গি করেন যে, প্রকাশিতব্য ছবিটি ফিলিমের ইতিহাসে যেন যুগান্ত আনতে চলেছে। শ্যুটিংয়ের অভিজ্ঞতাকে এমন বার খাওয়ানো হয় যেন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর মুখ থেকে সদ্‌গুরুসঙ্গ শোনানো হচ্ছে। পারস্পরিক পৃষ্ঠমর্দনের এমন অনুপম ইতিবৃত্ত পৃথিবীর কোন সিভিল সোসাইটিতেই লভ্য নয়। এ সব দেখে মালুম হয় যে, এই সমস্ত সমালোচনাও পৃষ্ঠমর্দনের এক্সটেনশন। পত্রিকার এডিটররা কী ভাবেন? পাঠক মাস্তুসোনা? যা খাওয়াবেন, তা-ই সোনামুখ করে খাবে?

ইতিমধ্যে আবার বাওয়াল। রিয়্যালিটি শো তার হাত্তা বাড়াচ্ছে। অ্যাদ্দিন গানা-বাজানা-নাচন-কোঁদন-ঘরের মধ্যে কোঁদল ('বিগ বস' স্মর্তব্য) এবং স্বয়ম্বর অবধি গিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল, তা এখন গড়াতে চলেছে শিশুপালন প্রতিযোগিতার দিকে।

কোন এক হিন্দি চ্যানেলে কয়েক জোড়া সেলিব্রিটি বাচ্চা সামলানোর অজুহাতে পরস্পরের সঙ্গে লড়বেন বলে প্রোমো দেখা গেল। লড়ুন গে' যান। অন্য কিছু নিয়ে লড়ুন। এই সব আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর কম্পিটিশনবাজদের কোপে পড়ে শিশুটির বা শিশুগুলির কী দশা হতে পারে, ভেবে দেখেছেন কি? রিয়্যালিটি শো-তে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ, তদ্‌সঞ্জাত সোশ্যাল অ্যানোম্যালি ও তাদের বাবা-মা-দের হ্যাংলাপনা নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু মানবাধিকারবাদী সংগঠন ও মাথা-ঠাণ্ডা ইন্ডিভিজুয়াল সরব হলেও, সে সব রমরমিয়ে চলছে। এক কিশোরী প্রতিযোগিতার চাপে স্নায়ুনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসলেও কিছুই বন্ধ হয়নি। কিন্তু এ বার কখনও এক লাফে এক্কেবারে কেদারনাথে, দুধের শিশু নিয়ে নখরাবাজির সূচনা ঘটতে চললেও কেউ কিছুই বলছেন না। অথচ চিলড্রেন শো-গুলোতে এই সব সেলেব-রাই তাদের তোল্লাই মারেন, শিশু দিবসে পথশিশুদের মাঝে গিয়ে মিডিয়ার ক্যামেরায় মুখ দেখান, অন্য পরবদিনে আরও নানা শিশুবাজি করেন। ব্যাপারটা সেই কানাঘুষোয় শোনা সুলতানেটের উটের রেসের মতো হচ্ছে না তো, যেখানে সুলতান, তৈল ব্যারন আর সাহেব-মেমরা বাজি ধরেন আর ছুটন্ত উটের পিঠে বাঁধা থাকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে চালান হওয়া শিশু? 'জানে ভি দো ইয়ারো' ছবির সেই বিখ্যাত নৌটঙ্কি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে— যখন স্টেজে মহাভারত হচ্ছে, তখন বিভিন্ন ঝুলঝাপুটির ফলে হিরো, ভ্যাম্প, ভিলেন— সব্বাই স্টেজে উঠে যা-খুশি করছেন। নৌটঙ্কির কুশীলবরাও বিভ্রান্ত। একা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অন্ধত্বের প্রতি নিষ্ঠা রেখে শুধু চেঁচিয়ে চলেছেন— 'ইয়ে সব কেয়া হো রহা হ্যায়! ইয়ে সব কেয়া হো রহা হ্যায়!'

অপূর্ব শোভন ভবজলধির পারে. . .

বাংলা ফিলিমে 'বনেদি বাড়ি'র কেলেচ্ছা দেখানোর একটা কুলুজি যদি বানানো যায়, তো কেমন হয়? খুব ধরা-করার মধ্যে না-গিয়েও বলা যেতে পারে যে, সিস্টেমেটিক ভাবে 'সাহেব-বিবি-গোলাম' থেকেই এই পয়জার শুরু। বিশ শতকের সেকেন্ড হাফে উপন্যাস হিসেবেও 'সাহেব-বিবি-গোলাম' আভঁ গার্দ ছিল। ঢের পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়' লেখেন। যাই হোক, ফিলিমে 'সাহেব-বিবি-গোলাম' উত্তীর্ণ হবার পর তার হিন্দি ভার্সানও সর্বভারতীয় হিট হবার পর 'বনেদি বাড়ি' আর্কি-

টাইপের ঢল যদি না-ও নেমে থাকে, এ কথা কেউই নাকচ করবেন না যে, সেই থেকেই বাংলা ছবি এক প্রকার অদ্ভুতুড়ে কস্টিউম ড্রামাকে বেশ তোল্লাই দিতে শুরু করে। 'লাল পাথর' থেকে 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী', আবার তা থেকে সুখেন দাস জমানায় 'সিংহদুয়ার', প্রভাত রায় জমানায় 'শ্বেতপাথরের থালা', এ সব দেদার হয়েছে।

কিন্তু যথাযথ বাচনসম্মত ভাবে 'বনেদি বাড়ি' টলিউডে জেঁকে বসে গত শতকের শেষ দশক থেকে। ফিলিমে, সিরিয়ালে থই-থই করতে থাকে 'বনেদিয়ানা'। দড়ি-বাঁধা বেনিয়ান-পরা কত্তা, এক গা ডুমো-ডুমো গয়না-পরা গিন্নিমা, চাড্ডি সিউডো ভিক্টোরিয়ান আসবাব, হরেক রঙের কাচ-বসানো দরজা-জানালা, চৌখুপ্পি মার্বেলের মেঝে, চোঙামুখো কলের গান— এই সব শোভিত একটা পরিসর নির্মিত হয় এবং তা রেকারিং ডেসিমেলের মতো ধ্যারা-রা-রা করে চলতেই থাকে। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'বাড়িওয়ালি', 'উৎসব', 'চোখের বালি'— গপ্পো বাদ দিলে যেন একই সেট, একই কস্টিউম, একই ছাঁচ, বর্ণ এক। গন্ধ এবং স্বাদ কি আদৌ আলাদা?

সমস্যাটা 'পিরিয়ড পিস' নির্মাণ নিয়ে। কোথাও যেন একটা আইডিয়া সেট হয়ে আছে যে, পুরনো কলকাতা (গ্রাম-মফস্বলের জমিদারবাড়িও হতে পারে) মানেই ঐ। জোছন দস্তিদারের সিরিয়াল 'সেই সময়' থেকে যদি বাংলা সিরিয়ালের বনেদি কেচ্ছার শুরুয়াৎ ধরি, তবে একটা কথা বলতেই হবে যে, জোছনবাবুদের কাছে তাঁদের কর্মকাণ্ড জাস্টিফাই করার জন্য কিছু সলিড বক্তব্য ছিলই। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তের গন্ডা-গন্ডা বাংলা সিরিয়াল এ বিষয়ে কী বলবে? মিনিট-তিনেক যদি কেউ 'ওগো বধূ সুন্দরী' সিরিয়ালটার ওপর চোখ রাখেন, তো কতগুলো প্রশ্ন তাঁর মনে উঠতেই পারে। এই একবিংশ শতকে কোথায়, কলকাতার কোন্ প্রান্তে, বাংলার কোন্ কানাচে একটা ঢাউস যৌথ পরিবার রয়েছে, যারা ভিক্টোরীয় আসবাব ব্যবহার করে, যাদের গায়ে এসে লাগে জানালার রঙিন কাচের রামধনু, এক গা গয়না পরে যাদের মেয়ে-বউ সারাদিন ঝমঝমায়, যাদের পুরুষদের কোন কাজ নেই, সারাদিন বাড়ির মেয়ে-বউদের পেছু-পেছু ঘোরে আর কূটকচাল করে? একই মাল 'বউ কথা কও'তেও। সমাজবিদ সুমন্ত বাঁড়ুজ্জে-মশাই অনেক দিন আগে লিখেছিলেন যে, উনিশ শতকে কলকাতার নিম্নবর্গীয় মানুষজন তাদের লোকসাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতে উচ্চবর্গের সমালোচনা করত বনেদি বাড়ির কুচ্ছো গেয়ে। তো, দেদার জল শহরের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বয়ে গেছে গত এক-দেড়শো বছরে। হুতোমি কলকাতা কি বদলায়নি? নাকি, বদলেছে? খেলা ঘুরেছে? টিভি সিরিয়ালের পরিচালক, ফিলিম ডিরেক্টর— এঁয়ারা আজ নিঃসন্দেহে সমাজের মাথালো লোক। তাঁদের 'নিম্নবর্গ' বলি

কোন্ দুঃসাহসে! অথচ তাঁরাই এই আজগুবি, কস্টিউম-সর্বস্ব, অলীক বনেদিয়ানা বানিয়ে গেলাচ্ছেন দর্শকদের। তার মানে এমনটাই দাঁড়ায় না কি যে, দর্শক মাত্রেই 'নিম্নবর্গীয়', তাদের চৈতন্যে যেন তেন প্রকারেণ 'বড় মানুষে'র কেচ্ছা খাওয়াতেই হবে? 'সোশ্যাল এলিটিজম'-এর সংজ্ঞা একুশ শতকে যে আর বেনিয়ান, বেলোয়ারি, জাজিম, জলসাঘরে থমকে নেই, তা দশ বছরের খোকা-খুকুও জানে। এই হাইপার-রিয়্যাল 'বনেদিয়ানা'র সাতবাসটে ঘি দিয়ে আর কত ভাত মাখা যায়?

বাংলা ফিলিম আর সিরিয়ালের এই যৌথ পয়জারের বাইরে যদি পরিচালকরা একটু ভাবতেন। আজকের 'সোশ্যাল এলিট'দের তেঁএটেপনা, মিডিয়াবৃত্তের হ্যারাস-মেন্ট, কর্পোরেট থেকে শুরু করে হা-ঘরে টেলিপ্রোডাকশন হাউসেও অনাবিল কাউচ ইনভিটেশন, ব্যাঙের ছাতা মিডিয়ার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কলাকুশলীদের না-পাওয়া অনেক মাসের পেমেন্ট, 'রিয়্যালিটি শো'র নামে নিরন্তর ছকবাজি, 'আইমাইটিস' রোগে ভোগা 'সেলিব্রিটি'দের মিছিল, আড়ালে ল্যাং ও প্রকাশ্যে ভাই-ভাতিজা ভাব-দেখানো আদেখলেপনা ইত্যাদি মশলা দিয়ে কি একটা অন্তত নতুন সিরিয়াল বানানো যায় না? বলিউডে এই সব ইস্তেমাল করেই মধুর ভাণ্ডারকর দাঁড়িয়ে গেলেন, বাংলা গ্রুপ থিয়েটারেও ব্রাত্য বসু এই নিয়ে একটা জমকালো নাটক দাঁড় করিয়েছেন। সেলুলয়েড (থুড়ি, ডিজিটাল) ভাইদের অ্যাতো ভয় কীসের? এ সব তুললে কি তাঁদের মুখোশ-পেন্টুলুন স্থানবিনিময় করে ফেলতে পারে?

মিডিয়া-পরবশ এই তুচ্ছ জগতে দর্শক-শ্রোতা সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। তাই লইয়াই থাকি। পুজো শেষ। রণক্লান্ত কুরুক্ষেত্রের মতো বাংলা বাজারে ফুট-ফাট আওয়াজও তুলল না পুজোয় বেরুনো এক রাশ বাংলা গানের অ্যালবাম। পুজো-সাহিত্যে তো কবে থেকেই ঢু-ঢু। ওদিকে আবার এক নামজাদা সাহিত্য পাক্ষিকের সম্পাদক বিরাট উৎসাহ নিয়ে লিখেছেন, এমন পুজো-সাহিত্য খুব কম সময়েই হয়, নাকি আজকের পুজো-সাহিত্য তার ঐতিহ্যের যথাযথ উত্তরসূরী। আরে, কী সব হাবিজাবি আবোল তাবোল। তা, তাঁদের হাতেই কলম, ছাপাখানা, মিডিয়া, দলবল, মাফিয়া, জিগোলো, জগঝম্প। পাঠক হালচাষে বাতিল বলদ, সাহিত্যসীমার প্রান্তে বসে জাবর কাটে।

তবে ঐ যে, গানের ব্যাপারে বিষয়টা বড় বেশি বোঝা যায়। লোপামুদ্রা, ইন্দ্রনীল, শ্রীকান্ত, রাঘব, রূপঙ্কর প্রমুখ বছরে ক'টা অ্যালবাম বার করেন? অত গান যায় কোথায়? কে খায়? কে গেলে? এ সব বিষয়ে একটু ঝাঁক মারলে হয় না? একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্দি, ব্যান্ডের ব্যান্ড বেজে গেছে, এ বাজারে ফসিলস্ তুমুল আত্মঘোষণা আর 'আইমাইটিস' সহকারে তাঁদের অ্যালবাম ছাড়লেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে শেয়ালদা সাউথ সেকশনের লক্ষ্মীকান্তপুর বা ডায়মন্ডহারবার লোকালে

বিক্রি-হওয়া 'ফটাস জলে'র মতো, ছিপি খোলার সময় দুর্দান্ত আওয়াজ হয় বটে, তবে ঐ বিস্বাদ পানীয় গেলার পর একটা মিনিমাম ঢেকুরও ওঠে না।

সামনে যা দেখি, জানি না 'সে কী'

বড্ড ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছি ইদানীং। অবশ্য মিডিয়াবাজির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারা খুব সোজা কথা নয়। এই বাংলা ছবির কথাই ধরুন না, মন-মর্জি পড়ে আছে সেই আশির দশকে। সুখেন দাসের গ্যাদগ্যাদে সেন্টু, অঞ্জন চৌধুরীর যাত্রালজি— দু'-একটার ছোঁয়া পেয়েই সিঁটিয়ে গেসলাম। তাপ্পর বাংলা বাজারের কী হয়েছে, খবর রাখিনি। অভ্যেস বজায় রাখি, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হবে ভেবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি বাংলা সিনেমার থেকে। কিন্তু ঐ যে, অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। পেশাগত কারণে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে একটু-আধটু ইন্টার‍্যাকশন হয়। ঋতুপর্ণ দেখি না, অঞ্জন দত্ত দেখি না, আরও সব মানবিক সম্পর্কের উথালপাথালে থরো-থরো সিনেমার যে-ঢল নেমেছে, তার খোঁজ রাখি না, ফলে প্যাঁক খাই। মাঝে-মধ্যেই প্রতিজ্ঞা করি নিজেকে আপডেটেড রাখব। কিন্তু কী ভাবে? ছাপোষা লোক, আইনক্স-ফোরামবাজি করলে মাসের শেষে রেস্ত ফুড্ডুৎ হবে, তাই টিভি-ই ভরসা। কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে?

কয়েক দিন আগে কোন এক টিভি চ্যানেলে 'অন্তহীন' দিয়েছিল। তো, কার্য-ব্যপদেশে সে সময় বাড়ি ছিলাম না। এমন সময়ে এক অগ্রজের ফোন— কোথায় রয়েছি। তলব কেন জানতে চাওয়ায় তিনি জানালেন, অন্তহীন ছবিতে অপর্ণা সেনের মুখে একটি সংলাপ রয়েছে, যেখানে তিনি 'পৃথিবীতে নাই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরি' পঙ্‌ক্তিটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। খোঁজ করতেই 'অন্তহীন'-এর ডিভিডি পাওয়া গেল। ছবির উনত্রিশ মিনিট বাহান্ন সেকেন্ডের মাথায় অপর্ণা সেন ছবির নায়িকাকে বলছেন— 'পৃথিবীতে আদর্শ রিলেশনশিপ বলে কিছু নেই। সেই যে সুনীল গাঙ্গুলীর লাইনগুলো আছে না! পৃথিবীতে নাই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরি. . .।' স্তম্ভিত হলাম। আজীবন এই লাইনগুলো কানের কাছে আওড়ানো হয়েছে জীবনানন্দের লাইন হিসেবে। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের 'সৃষ্টির তীরে' কবিতায় রয়েছে—

'কুইসলিং বানাল কি নিজ নাম— হিটলার সাত কাণাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল:
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছ নাজেহাল;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।'

লীলা মজুমদারের ভাষায় মনের মধ্যে সন্দেহরা ঝাঁক বেঁধে আসতে লাগল। ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঠিক কতটা? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বড় কবি, মানী লোক। তা ছাড়া তিনি দেদার লিখেছেন। কিন্তু তিনি যে জীবনানন্দের কবিতারও রচয়িতা, এ তথ্য আগে জানতাম না। জীবনানন্দ-বিশেষজ্ঞ শ্রী ভূমেন্দ্র গুহ, শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রী বীতশোক ভট্টাচার্য-মশাইদের এ বিষয়ে একটু নজর দিতে বলছি। জীবনানন্দের সব কবিতা তাঁর নিজেরই লেখা তো? নাকি, 'সাতটি তারার তিমির'-এর রচনাকাল ১৩৩৫ থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, সেই সময়কালে শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১৩৪১ বঙ্গাব্দ) জন্মের আগেই অথবা মাত্র নয় বছর বয়সের মধ্যেই এই পঙ্‌ক্তিগুলি রচনা করেছিলেন, যাকে হয়তো জীবনানন্দ ভালোবেসে গ্রহণ করে-ছিলেন (প্লেজিয়ারাইজ করেছিলেন বলতে বাধল)? নাকি, বিষয় আরও গম্ভীর?

শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবশত চিত্রনাট্যকার তথা সংলাপ-রচয়িতা আবহমান বাংলা কবিতাকেই তাঁর রচনা বলে মনে করেন? মানে, চর্যাপদ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কাব্যজগতে যা কিছু লেখা হয়েছে, সবই তাঁর? যদ্দুর জানি, শ্রীমতী অপর্ণা সেন জীবনানন্দের আত্মীয়া। তিনি 'ইন্টেলেকচুয়াল'ও বটে (বিদ্বজ্জন শব্দটি সচেতন ভাবে পরিহার করলাম, কে আবার গায়ে কখন তকমা এঁটে দেয়)! তিনিও অবলীলাক্রমে সংলাপটি আউড়ে গেলেন। তারপর ছবির মাথালো-মাথালো কলাকুশলীরা, সঙ্গীত পরিচালক, গীতরচয়িতা— এঁয়ারাও কিছু বললেন না। ছবি রমরমিয়ে চলল, শহর জুড়ে ওস্তাদম্মন্য পাবলিক ছবি হাঁ করে গিললেন। অথচ বিষয়টা কারও নজরে এল না। তদুপরি, অপর্ণা সেনের সংলাপে ছিল 'পৃথিবীতে নাই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরি' উদ্ধৃতিটিও ভুল। জীবনানন্দ চলিত ভাষাতেই 'চাকরি' লিখেছিলেন। আচ্ছা, সুনীলবাবু কি ছবিটা দেখেছেন? তাঁর কী মতামত?

ভ্যানতাড়া রেখে আসল কথায় আসি। বাংলা ছবি মরুক, বাঁচুক, ডিগবাজি খাক, এতে বাংলা কবিতার কিস্যু আসে যায় না। হাজারো ভ্যাপ্পোর পোঁ সত্ত্বেও বাংলা কবিতাকে মিডিয়াসেদ্ধ করা যায়নি, যাবেও না। কিন্তু এই সিউডো-আঁতেল চলচ্চিত্র কর্তারা কেন, কীসের অভিলাষে যেখানে-সেখানে পদ্য কপচান? কী লাভ এতে? তাঁদের এই ন্যাকামি-সর্বস্ব, ইন্টিরিয়র ডেকরেশনের বিজ্ঞাপন-মার্কা, মেকি ছবি-গুলোতে কবিতার পুলটিশ লাগিয়ে ততোধিক আবোধা, আনপড় দর্শককুলকে চমক দিতে চান? বাংলা কবিতা বং-কালচারের বৃত্তের বাইরে বহু দূরে পড়ে থাকা এক

নন-প্রফিটেবল সেক্টর এবং বাংলা কবিকুলও এই সব হাবিজাবি ছবির থেকে দূরে থাকেন। তবে কার জন্য এই মায়া উৎসার?

অমঙ্গলের শেষ এখানেই নয়। ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর 'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এর নায়ককে কবি বানিয়েছেন, আর তাঁর লেখা কবিতাগুলোর নেপথ্য রচয়িতা একজন সত্যিকারের কবি। সেই সত্যিকারের কবি আবার সিনেমার জন্য রচিত কবিতা-গুলোকে নিয়ে বই করে সত্যি-সত্যি বাজারে ছেড়েছেন এবং ঐ ছবিতে এক সিনের জন্য অভিনয়ও করেছেন। হেভি ঘাঁটা ব্যাপার। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড় থেকে রামেশ্বরের কাঁধে, রামেশ্বরের কাঁধ থেকে সৌদামিনীর কোলে, আবার সেখান থেকে উদোর পোর্টম্যান্টোয় এসে ঢুঁসোচ্ছে। 'কার পদ্য কে লেখে'— এ নাম দিয়ে চিৎপুর সামনের রথযাত্রায় একটা টোটাল যাত্রাপালা না নামিয়ে বসে! এই দুটোতেই যথেষ্ট জব্দ হয়েছি। আপডেটেড থাকার বাসনা উবে গেছে। বাংলা মেনস্ট্রিম ছবি তার টোকাটুকি নিয়েও এই মেকিপনার মধ্যে নেই। রাজ চক্রবর্তী বা রবি কিনাগী-মশাইরা অন্তত এদের থেকে অনেস্ট থাকার চেষ্টা করেন। বাঙালি আঁতেল দর্শকের মুরোদও বোঝা গেল এই সব ঘটনায়। তাঁদের আঁতলামির তল কদ্দুর, তা-ও জানা গেল। আর নয়, বরং হলিউড দেখি, হিন্দি জনপ্রিয় ধামাকা ছবি দেখি, এ সব বেমক্কা আদেখলেপনার থেকে দূরে থাকব।

একটু তালভঙ্গ করেই জানাই, সংগীত বাংলা চ্যানেলের সুবাদে মেনস্ট্রিম বাংলা কিছু সাম্প্রতিক গান শোনার সুযোগ হল। জিৎ গাঙ্গুলিকে যত দিন যাচ্ছে, আশ্চর্য লাগছে। বাংলা ছবির চিরাচরিত ওয়েয়িং সুরের কাঠামোকে বাতিল করে জিৎ যে-ভাবে গিটারের ওপর সুরকে রাখছেন, তাতে বিপ্লব না ঘটে যায়! 'প্রেম আমার' ছবির গানের পিকচারাইজেশন অনবদ্য, লিরিকও দুঃসাহসী। আঁতেলম্মন্যরা এর থেকে দূরেই থাকেন। কিন্তু গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কাজ যে শুরু হয়েছে, বস্। সদর দফতরে কামান দাগা শুরু হল বলে। স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, ফুটফুটে নায়ক-নায়িকারা অত্যন্ত ক্যাজুয়াল ভাবে বাংলা ছবিতে পা রাখছেন, বাতিল মুন্নই হিরো আর ডাব-করা নায়িকা নিয়ে বস্তাপচা আঁতেল ছবির দিন শেষ হল প্রায়।

ডিলানের গিটার আর ভ্যাবাচাকা

বব ডিলানের নাম কি এ বার নোবেল নমিনেশনের তালিকায় উঠেছিল? বেশ কয়েক হপ্তা আগে তাই নিয়েই কি কোন একটা বং চ্যানেল অঞ্জন দত্ত আদি 'বাংলার ডিলান'কুলকে নিয়ে ক্লক ভরাচ্ছিল? সদাসর্বদা সতর্ক থাকা উচিত জানি, কিন্তু কেকেজিএন-এর ('খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না'-র এই অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম সম্প্রতি এসএমএস-এ এক শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং-প্রাক্তনীর কাছ থেকে লাভ করেছি) কলমচি হিসেবেই তো জীবন কাটালে চলে না, বারো ধান্ধায় ঘুরতে হয়। তাই সে অনবদ্য নৌটঙ্কি দেখে উঠতে পারিনি। গত বছর বারো-পনেরো ধরে কী অনবদ্য প্রক্রিয়ায় বব ডিলান ও আরও কয়েক জন পাশ্চাত্য সঙ্গীত মায়েস্ত্রো বাংলার ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছেন, সুদূর মার্কিন দেশে বসে ডিলানাদি মহাত্মাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় জানা এখানে, এই বাংলায় তাঁদের নিয়ে কী প্রকার কেত্তন চলে? বং-দের পক্ষেও এমত পরিসর বিশেষ সুবিধের। কারণ যা-খুশি করা যায়। কেউ আপত্তি করতে আসবে না। হাঁ করে যারা সারা দিন টিভি দেখে, তারা ডিলান-টিলানের খবর রাখে না, বড়জোর মাইকেল জ্যাকসন দেহ রাখলে শ্যামবাজার কি গড়িয়াহাটে গিয়ে পাইরেটেড ডিভিডি কিনে আনে।

সুতরাং, বং-চ্যানেলের ক্লক ভরানোর জন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত একটা বেশ নিরাপদ আশ্রয়। কলকাতা টিভি তার পূর্বতন ইনিংসে এক প্রকার আঁতলামি প্রায়শই করত। একবার তো উডস্টক-এর কত যেন বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বেশ ধামাকাদার একটা আলোচনাচক্র বসানো হয়েছিল। তো ভাবি, এই সব প্রোগ্রামের প্রতি আমদর্শকের সংবেদটা ঠিক কী? আম-পাবলিক, যাঁরা 'ওগো বধূ সুন্দরী' আর 'দুর্গা' দেখেন, তাঁদের কাছে 'উডস্টক' শব্দটা আদৌ কোন দ্যোতনা বহন করে কি? এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে 'উডস্টক' বা 'ডিলান'-এর হার্মেনিউটিক যাঁরা জানেন, তাঁরা এই কসমোপলিটান বৃত্তে উচ্চবর্গীয়। অগণিত বাঙালি সারা দিন ধরে যা সাংস্কৃতিক প্রডাক্ট কনজিউম করেন, তার টোটালিটিকে বোঝা কোন সমাজবিদের পক্ষেই সম্ভব নয়। সুদূর লালগোলা, কী ধূপগুড়ির গৃহবধূ যে ডিলান বা উডস্টকে মজবেন না, তা কি এই সব টিভি-কর্তারা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন, আর তাই, কলকাতা টিভি'র প্রথম ইনিংসের সময়কার এক কর্তাব্যক্তির মন্তব্য ছিল, তাঁদের চ্যানেল নাকি টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে লিটল ম্যাগাজিন। ভাবতেই অনুকম্পা জাগে যে, এই সব চ্যানেল প্রফেশনালও হতে পারবে না, আর 'লিটল ম্যাগাজিন'-সুলভ নিষ্ঠাও এরা অর্জন করতে পারবে না। লিটল ম্যাগাজিন অ-ব্যবসায়িক উদ্যোগ, টিআরপি-

বিজ্ঞাপন অলাতচক্রের ঘুরন খাটোলা বং-টিভি তার মেজ ক্যাপিটালের আওতায় থেকে এ হেন আদেখলে আবদার করে কোন্ সাহসে?

আসল কথা, ক্লক ভরাট। টিভি চ্যানেলগুলো এত দিন প্রোমোটার-সংস্কৃতির অ-আ-ক-খও জানল না যে কী করে সরোবর, নদীনালা, খালবিল ভরাট করতে হয়? সিপিএম-এর কালচারাল ফেলিওর আর কত দেখব? যাই হোক, সে স্টারানন্দ (এক আধ্যাত্মিক যোগীপুরুষ)-ই হোক আর নী(চ?)-বাংলাই হোক, সকল শিবা-কুলের একই হুক্কা-হুয়া। স্পনসর দুলদুল করছে, অথচ ক্লক ফাঁকা, তো ওখানে গুঁজে দাও যা-খুশি, তা 'ডিলান'ও হতে পারে, আবার পেডিকিওরও হতে পারে। কে গিলবে, বড় কথা নয়। এ প্রশ্নও জাগে যে, এই 'বং'গো দেশে যে-গিটারপুঙ্গবরা বিগত দু'-দশক ধরে দাপাচ্ছেন, তাঁরা কি জানেন না যে বাইপাসের পূর্ব দিকের জনবসতিতেও তাঁদের কেউই চেনেন না। আমবাঙালি এখনও যে হেমন্ত, মান্না, কিশোর, মানবেন্দ্রতেই আটকে, তা তাঁরা কবে বুঝবেন? পাঁচগ্রাম কি শিয়াখালায় যে-হোল নাইট জলসা হয়, তাতে অঞ্জন দত্ত ডাক পান? সুমন (তখন চট্টোপাধ্যায়) একটা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তাঁর গানের টালা থেকে টালিগঞ্জে আটকে যাওয়ার কথা। পোড়-খাওয়া সেই দীপ্তবুদ্ধির মানুষটি এর কারণও জানতেন, আর তার জন্যই তিনি তাঁর গান নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি, যা বাকিরা করেছেন, করে চলেছেন। নিজে যা গান, গান না, এর মধ্যে ডিলানকে ঢুকিয়ে তাঁদের গৌরব কোথায় বাড়ে? যাঁরা সত্যিকারের ডিলান-ভক্ত, তাঁদের বয়ে গেছে অঞ্জন দত্ত শুনতে।

কলকাতা যে পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত একটা ক্রোনোটোপ— এ কথাও ঠিক নয়। হার্বি হ্যানকক-এর মতো সঙ্গীতশিল্পী এ শহরে পারফর্ম করে যান। কিন্তু তাঁর পশ্চাতে তো স্টারানন্দ, আর প্লাস, কলকাতা টিভি দৌড়য় না, কর্তাব্যক্তিরা হয়তো হ্যানকক বা তাঁর প্রোফাইলের জ্যাজ-মায়েস্ত্রোদের নামই জানেন না। কী উপায়ে বং-চ্যানেলের কর্তা হওয়া যায়, তা জানতে বড়ই ব্যগ্র আছি (চুনোপুঁটি টেলি-জার্নালিস্ট হয়ে লাভ নেই, প্রায়শই মাইনে বাকি থাকে)। হ্যাঁ, এখেনে একটা কতা আছে। কর্তাব্যক্তিদের তো আর স্ক্রিনে দেখা যায় না। তাই তাঁদের নিয়ে বিশদ মশকরাও করা সম্ভব নয়। স্টারানন্দ যখনই খোলা যায়, তখনই এক বিশেষ উপ-স্থাপক-সংযোজককে দেখা যায়। এর রহস্যটা কী? ধরা যাক, তাঁর নাম কেমনবাবু। এই কেমনবাবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্টারভিউ নেন। আশা ভোঁসলেরও। নন্দী-গ্রাম সংক্রান্ত প্যানেল ডিসকাশন-এ থাকেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্তেও। এই কেমনবাবুই হংকঙে গিয়ে ব্যাঙের ঠ্যাং চিবিয়ে দেখান, ইনিই আবার ব্যান্ড সঙ্গীতের তালেবর সম্মেলনে কো-অর্ডিনেট করেন। বিরল প্রতিভা। এত বহুমুখীনতা গত

একশো বছরে কোন বাঙালির মধ্যে দেখা যায়নি। শশধর দত্তের মোহন সিরিজের কথা মনে পড়ে যায়। এর পর হয়তো দেখা যাবে 'তৃণমূলে কেমন', 'নন্দীগ্রামে কেমন', 'ভূ-উষ্ণায়নে কেমন', ব্যাঙের ঠ্যাঙে কেমন'— এই সব নাম দিয়ে চটি-চটি পুস্তিকা কোম্পানি বাজারে ছাড়ছে। মাঝে-মাঝে মনে হয়, উনিই সেই ব্রহ্ম নন তো, যিনি 'সর্বত্র খল্লিদ্বং' অর্থাৎ সর্বত্রই খলবল করছেন। ধন্য 'বং'-গোদেশ। ভাগ্যিস সেলুকাস-সহ আলেকজান্ডার অ্যাদ্দুর আসেননি, এলে শুধু 'বিচিত্র'তে হত না, হয়তো বাক্‌রোধ আর শ্বাসরোধ হয়ে ব্যাবিলনের আগে এখানেই সসৈন্যে পটল তুলতেন।

চেনা দুঃখ, আধা-চেনা কিছু সুখ

বাঙালির ফ্যান্টাসির দৌড় অনেক। আমরা খবর রাখি না। ঘরের মুর্গি ডাল-বরাবর হয়ে ঘরের চালে কোঁকর-কোঁ করে, আমরা বং-গোবিন্দরা তাকে খালপোস করে কখন ভোজ্য তেলে ছাঁকব, সেই ধান্ধাতেই থাকি, অর্থাৎ শাদা বাংলায়, বঙ্গীয় 'সেলেব' সমাজে যাতে কোন কৃতী (হ্যাঁ, সত্যিকারের) বঙ্গসন্তান যাতে না-ঢুকতে পারেন, সে বিষয়ে বজ্র আঁটুনি থেকে ফস্কা গেরো পর্যন্ত আউস বন্ধন-পাউস বন্ধন দিয়ে রাখি। এই সুজয় ঘোষের কথাই ধরুন না, ভদ্রলোক একটা ছবি করেছেন। 'আলাদিন' নামের সেই ছবি গত হপ্তায় মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এই বঙ্গীয় জলবায়ুতে এক সপ্তাহেই মালুম, সে ছবি ফ্লপ। বঙ্গীয় সংবাদমাধ্যমগুলো এ ছবির বিষয়ে 'চলে যায়' গোছের একটা অ্যাটিটিউড দেখিয়েছে। কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু এ ছবি শুধু 'চলতা হ্যায়' নয়।

এ দেশে প্রকৃত ফ্যান্টাসি ছবির বাজার ভালো নয়। বিশুদ্ধ সায়েন্স ফিকশন অথবা নিপাট রূপকথা এ দেশের লোকে খায় না। ফ্যান্টাসি গড়তে গেলেই তাতে সাপ মেশাতে হয়, শিব মেশাতে হয়, নারায়ণ মেশাতে হয়, বগেরা-বগেরা। 'মিস্টার ইন্ডিয়া' বা 'লাভ স্টোরি ২০৫০' চলা বা না-চলায় লাক ফ্যাক্টর কাজ করে। সুজয় ঘোষ নিশ্চয়ই এ সব জানেন। আর জেনে-বুঝেই তিনি সাপহীন, শিবহীন, নারায়ণ-হীন এক নিপাট ফ্যান্টাসি ছবি তৈরি করেছেন। 'ফ্যান্টাসি' সর্ব অর্থেই, যে-ছবির গোড়াতেই ভারতের ম্যাপ দেখিয়ে 'খোয়াইশ' নামের একটা নগরকে খোঁজার চেষ্টা

চলে, মালুম হয় এর পর কী হতে চলেছে। টাইটেল কার্ডেই পরিচালক বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই 'আলাদিন' ডিজনির কপি নয়, আবার আরব্য রজনীর পুনরুদ্ধারও নয়। এ ছবি এক মহত্তর 'স্কিট'।

বাঙালির 'স্কিট'-এর ধারণা অবশ্য বেদম খারাপ। কলেজ ফেস্টগুলোতে 'স্কিট'-এর নাম দিয়ে প্যারডি ও ক্যাওড়া গানের ভাঁজাভাঁজিকেই 'স্কিট' বলে চালানো হয়। পরে সেই সব পাথেয় করেই বেশ কিছু বঙ্গপুঙ্গব 'সেলেব জোন' আলো করতে দৌড়ন। সাম্প্রতিক অতীতে এক বঙ্গসন্তানই এক অসামান্য 'স্কিট' উপন্যাস লিখে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই হইচই ফেলেছেন, আমরা খবর রাখি না। শমিত বসু নামের এই তরুণ 'গেম ওয়র্ল্ড ট্রিলজি' নামে যে-উপন্যাসত্রয় লিখেছেন, তাতে সারা বিশ্বের মিথ, রূপকথা, ছেলে-ভুলনো ছড়া থেকে শুরু করে হলিউড, রাওলিং, সুকুমার রায় মিলে-মিশে একাকার হয়ে জন্ম দিয়েছে এক আশ্চর্য জগতের, যেখানে রামায়ণ থেকে রুশদি পর্যন্ত কল্পনা স্বচ্ছন্দ, অনায়াস, অনাবিল।

সুজয় ঘোষের কাজ দেখতে গিয়ে শমিত বসুর কথা মনে পড়ল। রীতেশ দেশমুখ, সঞ্জয় দত্ত অসাধারণ। কিন্তু বিগ বি। বৃহৎ বৃদ্ধ এখানে জিনি, সুজয়ের ক্যামেরায় 'জিনিয়াস', সে অদৃষ্টের কাছে কন্ট্রাক্ট জব করে। আলাদিন চ্যাটার্জি এখানে সেই 'চোজেন ওয়ান', যাকে 'ম্যাট্রিক্স'-এও দেখা গেছে। ভিলেন ও তার সাকরেদরা সবাই পরিচিত, হলিউড এখানে সাবভার্টেড। গোটা ছবিটা জুড়েই এক সাবলাইম অন্তর্ঘাত খেলে যাচ্ছে আর এ সবের মধ্যেই সেই মহতী বৃদ্ধ, তাঁর যাবতীয় পূর্বতন মুদ্রাদোষকে টুসকি দিয়ে সরিয়ে গোটা আরব্য রজনীর ভার তাঁর সাতষট্টি বছরের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। স্ক্রিপ্টে, ডায়ালগে বুদ্ধি ঝকঝক করছে এ ছবির, আর এই বুদ্ধির লাপিস লাজুলিতে পালিশ মেরে তাকে দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছেন অমিতাভ, ম্যাজিক কার্পেট থেকে ম্যাজিক কমেট— ছবির ব্যাপ্তি অভূতপূর্ব। এ ছবি ছোটদের, না বড়দের, তর্ক চলতে পারে না। যেমন চলেনি আর-এক বঙ্গসন্তানের তোলা ছবি 'পাতালঘর'-এর ক্ষেত্রে।

কৈশোরে একটা দুঃখ ছিল, সত্যজিৎ রায় কেন প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে ছবি করলেন না। বরফি বা গবেষকের ল্যাবরেটরি তিনি বানাতে পারেন, শঙ্কুর গিরিডির ল্যাব আর এমন কী কঠিন! শঙ্কু চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অজয়বাবু ('সোনার কেল্লা'র ভিলেন, নকল 'ডক্টর হাজরা') ছিলেন, অবিনাশবাবু তো সন্তোষ দত্তকে দিয়েই হত। সত্যজিতের হলিউডি কানেকশনও কম ছিল না। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর মতো ব্যক্তিত্ব যদি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'তে অভিনয় করতে পারেন, তবে শঙ্কু সিরিজের বিদেশি চরিত্রের অভিনেতা পাওয়া এমন কী দুরূহ ছিল! এই একটা সাধ অপূর্ণ রেখেই মরতে হবে। তপন সিংহ অবশ্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। 'সফেদ

হাতি' বা 'আজ কা রবিন হুড' তার প্রমাণ। কিন্তু তার পর 'পাতালঘর' ছাড়া আর কিছু তো নজরে আসেনি। অবশ্য 'পাতালঘর'ও বক্স অফিস হিট ছিল না। হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু তার ভিডিও (আসল-নকল মিলিয়ে) কী পরিমাণে ছড়িয়ে গেছিল, তা সকলেরই জানা।

'পাতালঘর' দেখতে-দেখতেই মনে হয়েছিল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অনেক লেখার কথা। 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' এক আজব সিরিয়ালে পরিণত হয়ে দেহ রেখেছিল, তাকে কি বিগ স্ক্রিনে আনা যায় না? 'গোঁসাইবাগানের ভূত'? 'পাগলা সাহেবের কবর'? 'অদ্ভুতুড়ে'? কী বলেন সুজয়বাবু বা অন্যান্যরা? একটা ছবির পাবলিক রেসপন্স পজিটিভ না-হলে কি সে লাইন ত্যাগ করবেন? আমরা কি আমাদের মাতৃভাষায় একটা 'নেভার এন্ডিং স্টোরি' বা 'লাস্ট অ্যাকশন হিরো' পাব না? আমাদের ছোটদের 'শৈশব' কি আটকে থাকবে মায়ের পাশে বসে 'বৌ কথা কও' আর 'নাচ বলিয়ে'র ফাঁদেই?

মাঝে-মাঝে মনে হয়, যদি বছরে তিনটে ফ্যান্টাসি ছবিও বলিউড বানাতে পারে, তো এই ঘ্যাঁচড়ামার্কা দর্শকরুচির আমূল বদল ঘটে যেতে পারে। 'পেয়ার', 'হাম তুম', 'হোতা হ্যায়', 'লাগি কুড়ি দিলদার দি'-সংস্কৃতির জিগ্-স ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। স্কিট কিন্তু কখনওই প্যারডি নয়। তা এক অনন্য মিমিক্রি, যা আসলকে শ্রদ্ধা জানিয়েও নিজে এক স্বতন্ত্র আর্ট হয়ে উঠতে পারে। শমিত বসুর উপন্যাসে এ ঘটনা সার্থক ভাবেই ঘটেছে। ইটস এ স্মল ওয়র্ল্ড আফটার অল। সুজয় ঘোষ কি একবার শমিতের উপন্যাসকে ছবির জন্য ভেবে দেখবেন? 'পাতালঘর'-এর অভিজিৎবাবু কি আর-একটা শীর্ষেন্দু-কাহিনির চিত্রায়ণের কথা ভাববেন? লীলা মজুমদার? নাকি, বড্ড বেশি আশা করে ফেললাম? আশায় পকেট ভরেই তো রয়েছি। 'হলদে পাখির পালক' তোলা কি খুব কঠিন? অথবা 'বাতাসবাড়ি'?